শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

শ্রীরামকৃষ্ণকে শিক্ষক অভিধায় ভূষিত করলে তা সামান্যীকরণ মনে হতে পারে, কারণ তিনি জগদাচার্য, লোকশিক্ষক। তবে এই বিশেষণগুলি তাঁকে ঈশ্বরত্ব, অবতারত্ব ইত্যাদির মহিমায় যেমন ভূষিত করে তেমনই আবার আমাদের মতন সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে দূরেও সরিয়ে রাখে। নিজের অবতরণের উদ্দেশ্য ও তাঁর অবতারত্ব ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ''দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য''। এই পূর্ণশক্তি নিয়ে আবির্ভাবের মধ্যেও তাঁর মৌলিক বিশেষত্ব ছিল তাঁর অদ্বিতীয় মানবভাব যা আমাদের তাঁকে কাছের মানুষ, একান্ত আপন বলে ভাবতে সাহায্য করেছে। তিনি বলেছেন, অবতারে বিশ্বাস শেষ কথা। তাই তাঁর কাছে আগত মুষ্টিমেয় কজনকে বাদ দিলে প্রায় কেউই তাঁর অবতারত্বের সম্যক ধারণা করতে পারেননি, তবে প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের মানসিকতা অনুযায়ী নিজ নিজ আদর্শের প্রতিফলন দেখেছেন তাঁর মধ্যে। এছাড়াও কোনও কারণ না বুঝে বহু মানুষ শুধু তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছেন। বালক ভক্তেরা তাঁদের শুভ সংস্কার ও ঠাকুরের প্রেমের আকর্ষণে বালকসুলভ নির্ভর করেছিলেন তাঁর ওপর। পরিণত বয়সের সংসারী, সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ভক্তেরা তাঁকে কেউ কেউ অবতার বলে ঘোষণা করার চেষ্টা করলেও তাঁদের ব্যক্তিগত মুক্তির কাণ্ডারি বলেই বিশ্বাস করতেন। হৃদয় মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রাণপ্রিয় মামাকে অক্লান্ত সেবায় ভরিয়ে রেখেও তাঁর প্রতি মানুষের আকর্ষণকে নিজের বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টায় লাগাতে কসুর করেননি। প্রতাপচন্দ্র হাজরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েও তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত অল্পবয়সে তাঁর কাছে এসে তাঁকে শুধুমাত্র এক মজার মানুষ হিসেবে দেখে বলেছিলেন, ''আপনার কাছে মজা খুব''। মহিমাচরণ চক্রবর্তী তাঁকে সাধক বা একজন সিদ্ধপুরুষের বেশি মহিমা দিতে রাজি হননি, আর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁকে ঈশ্বর বলে নয়, মানুষ হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে রাজি।

অতএব তাঁর মানবরূপটির অন্তরে যাঁর যতটুকু দৃষ্টি গেছে তিনি সেইভাবেই তাঁকে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে উপেক্ষা করে থাকতে পারেননি কেউই। এই পছন্দ-অপছন্দ-নির্বিশেষে সকলের মনোযোগের মধ্যে থাকতে পারাই একজন শিক্ষকের সফলতার অন্যতম কারণ।

ঠাকুরের নিজস্ব শিক্ষা কতদূর এগিয়েছিল? তাঁর পারমার্থিক শিক্ষার পরিমাপ আমাদের ক্ষুদ্র বিচার-বিশ্লেষণের অনেক বাইরে পড়ে থাকে, তবে তাঁর ব্যাবহারিক ও জাগতিক বিষয়ের শিক্ষার আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি নিজে বলতেন, ''যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।'' তাঁর সারাজীবনই শেখা ও শেখানোর এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, তার মধ্যে জীবনের শেষ দশটি বছর নিরলস শিক্ষকের ভূমিকায় ব্যয়িত হয়েছে। আমাদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা প্রকৃতির প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত, যা আবার আমাদের প্রাক্তন সংস্কারজাত। শুভ্র, সংস্কারহীন প্রকৃতি ও তীক্ষ্মবুদ্ধি সমন্বিত বিচারশক্তি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। তাই জাগতিক ও ব্যাবহারিক বিষয়ের সদর্থক শিক্ষাগুলি তিনি অতি অল্পসময়েই আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন যা আমরা তাঁর পরবর্তী জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশিত থাকতে দেখি। পাঠশালায় তাঁর পুঁথিগত বিদ্যা সামান্যই এগিয়েছিল। স্বাভাবিক তীক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ হস্তলিপিতে প্রকাশিত হয়েছিল মুক্তাক্ষর ছন্দে। নিজেই বলছেন, ''চিত্র আঁকতে বেশ আঁকতে পারতুম, কিন্তু শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত।'' তাঁর জন্মগত একমুখী মানসিকতায় অঙ্কের হিসাব-কিতাবের কোনও সার্থকতা ছিল না, ছিল না সংসারযাত্রার বাইরে পুঁথিগত বিদ্যার কোনও সার্থকতা। তবে নানা বিষয় জানার আগ্রহ ও চেষ্টা চিরকালই ছিল তাঁর মধ্যে। শুধু বাদ সাধত তাঁর মন, যা ঈশ্বর বা ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তায় এমনই ডুবে থাকত যে তাকে প্রবল চেষ্টাতেও নামিয়ে জাগতিক বিষয়ে নিবিষ্ট করা মুশকিল হত। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখার ইচ্ছা হল, কেমন করে এই দৃশ্যজগতের ভিতরে অদৃশ্য ক্ষুদ্র বস্তুকে তার মধ্য দিয়ে দেখা যায়। এক ভক্ত সে-যন্ত্র নির্দিষ্টভাবে বসিয়ে তার মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে দেখতে অনুরোধ করলে তিনি মনকে নামিয়ে তার মধ্যে কিছুতেই নিবিষ্ট করতে পারলেন না। শ্রীম-র কাছে কখনও তিনি পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র বুঝতে চাইছেন, কখনও জিজ্ঞাসা করছেন জোয়ার ভাঁটা কী করে হয়। সূর্য, চন্দ্র, তাদের অবস্থান এঁকে মাস্টারমশাই তা বোঝাবার চেষ্টা করলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''মাথা টনটন করছে''।

আমরা জাগতিক বিষয় বা ব্যক্তির বিচারে যখন প্রবৃত্ত হই তখন মনের সিংহভাগ নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে অপরের কাছে জাহির করতে ব্যস্ত থাকে। তাই আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ খুব কম ক্ষেত্রেই সঠিকের কাছাকাছি পৌঁছয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি অবলম্বন করে সহজেই সঠিক মূল্যায়নে পৌঁছে যেত। যার ফলে কোনওরকম আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ না করেও তাঁর ব্যক্তি-মূল্যায়ন কখনও বেঠিক হয়নি। শিক্ষার্থীর মনোভাব ও তার গ্রহণক্ষমতা বুঝতে পারার ক্ষমতার ওপর একজন শিক্ষকের শিক্ষাদানের সফলতা নির্ভরশীল। এ-ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অনন্য। প্রত্যেককে তার মানসিকতা অনুযায়ী শিক্ষাদানে তিনি সমর্থ ছিলেন। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৫ ও ২৯ তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যারা কর্মফলে আসক্ত, কর্মযোগের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে ধারণাহীন, যোগযুক্ত মহাপুরুষ কখনও তাদের বুদ্ধিভেদ ঘটিয়ে তাদের বিপথে চালিত করবেন না, কারণ যা তারা ধারণা করতে পারে না তা তাদের উপদেশ করলে উভয়ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠাকুর এই উপদেশটির সামগ্রিক রূপ দান করেছিলেন এই বলে যে—কারও ভাব নষ্ট করতে নেই; পারলে তার ভাবটিকেই উচ্চতর লক্ষ্যে চালিত করে দিতে হয়। তাঁর শিক্ষাদানের ধারা লক্ষ করলে এটির প্রয়োগ অহরহ নজরে আসে। স্বামী যোগানন্দ তখন যোগীন, যত্রতত্র খেতে পারেন না, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে প্রবল নিষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে বেরিয়ে কলকাতায় বিভিন্ন ভক্তবাড়ি ঘুরে অবশেষে বলরাম মন্দিরে এসেছেন। সারাদিন কোথাও কিছু

গ্রহণ না করায় অবসন্ন। ঠাকুরও কোথাও তাঁকে কিছু খেতে বলেননি। এখানে পৌঁছেই বললেন, ''ওগো এ ছেলেটি সারাদিন কিছু খায়নি, তোমরা ওকে একটু জগন্নাথের প্রসাদ খাওয়াও।'' আবার মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই প্রিয়নাথ, অধর সেনের বাড়িতে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। অধর সুবর্ণ বণিক, তবে ঠাকুর ও অন্যান্য ভক্তরা সেখানে স্বচ্ছন্দে আহার করেন। মুখোপাধ্যায়দের আহার করতে সংকোচ হচ্ছে, যা অবশ্যই সামাজিক নিন্দার ভয়ে, কোনও নিষ্ঠাসঞ্জাত সংকোচ নয়। ঠাকুর তাঁদের ঠাট্টা করে বলছেন, ''এঁরা সবই কচ্ছেন, শুধু ওইটেতেই সঙ্কোচ। একজনের শ্বশুর ভাসুরের নাম হরি, কৃষ্ণ—এই সব। এখন হরিনাম তো করতে হবে?—কিন্তু হরে কৃষ্ণ, বলবার যো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে—'ফরে ফৃষ্ট, ফরে ফৃষ্ট, ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে' ইত্যাদি''। বলা বাহুল্য তাঁদের সে-ভুল ভেঙেছিল।

নরেন্দ্র ও মহেন্দ্র দুজনকে ঠাকুর দুভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রতিটি উপদেশ, তাঁর ভাবনা নিজের বুদ্ধি-যুক্তি দিয়ে যাচাই করেন, বিচার করেন। ঠাকুর তাঁকে উৎসাহিত করেন। এমনকী নিজে নরেন্দ্রের অবতারে অবিশ্বাস নিয়ে গিরিশের অবতারে বিশ্বাসের যুক্তির সঙ্গে তর্কবিচারে প্রবৃত্ত করান। তিনি জানেন যে নরেন্দ্র যখন অবতার মানবেন তা কেবল এক আবেগোদ্ভূত সিদ্ধান্ত হবে না, পরন্তু তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য ও যাথার্থ্য সম্যক উপলব্ধি হবে। এছাড়া নরেন্দ্রকে জগতে তাঁর ভাবপ্রচারের যন্ত্র হতে হবে, তাই তাঁর তূণে সবরকম যুক্তির শর থাকা প্রয়োজন। নরেন্দ্র পরে তাই বলেছিলেন যে, তিনি দীর্ঘকাল ঠাকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন তাই তাঁর এ-পথের প্রতি ইঞ্চি নখদর্পণে। আবার অপরদিকে মাস্টারমশাই মহেন্দ্রকে ঠাকুর প্রতিজ্ঞা করাচ্ছেন, ''বল আর বিচার করবে না''। তিনি হবেন ভাগবতকার; তাঁকে ঠাকুরের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ মন্ত্রজ্ঞানে পরিবেশন করতে হবে পূর্ণবিশ্বাসে, তাই তাঁর জন্য ওই ব্যবস্থা।

বালকভক্ত নিরঞ্জন সুগঠিতদেহ, ক্ষাত্রবীর্যের প্রতিমূর্তি। তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসার পথে নৌকায় ঠাকুরের সম্বন্ধে সহযাত্রীদের কটূক্তি শুনে নৌকা ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, তখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে বললেন, ''ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হতে আছে?... হীনবুদ্ধি লোকে কত কি অন্যায় কথা বলে... দাঁড়িমাঝিরা তোর কি অপরাধ করেছিল...।'' আবার ওই একই ঘটনা আর এক বালক ভক্ত যোগীনের সামনে ঘটলে যোগীন অজ্ঞ লোকের কটূক্তিতে বিচলিত না হয়ে চুপ করে রইলেন। তাঁর কোমল প্রাণ বিবাদ-বিসংবাদ এড়িয়ে চলত। ঠাকুর তা জেনে বললেন, ''শাস্ত্রে কি আছে জানিস—গুরুনিন্দাকারীর মাথা কেটে ফেলবে, অথবা সে স্থান পরিত্যাগ করবে। তুই মিথ্যা রটনার একটাও প্রতিবাদ করলি না?'' পাছে যোগীনের কোমল হৃদয়কে দুর্বলতা গ্রাস করে তাই তাঁর আলাদা শিক্ষা। একজন দক্ষ মালি যেমন নানা বৈচিত্র্যময় ফুলের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে একটি সুদৃশ্য তোড়া বানায়, সেরকম ঠাকুরও বালকভক্তদের কেন্দ্রে রেখে গৃহী ভক্তদের নিয়ে এক নজিরবিহীন তোড়া তৈরি করে জগতকে দিয়ে গেছেন, যার মাধুর্য ও সৌন্দর্য আজ জগদ্‌বাসী উপভোগ করছে।

যদিও অল্পবয়স থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষকসত্তার প্রকাশ দেখা যায়, তবে তার সুচিন্তিত প্রথম প্রয়োগ দেখি তাঁর বালিকাবধূর ওপর। সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি, গুরুজন ও স্নেহভাজনদের প্রতি আচরণ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্কের শিক্ষা, রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় কী করণীয়; অতিথি, ব্রাহ্মণ, দেবতার সেবা কীভাবে করা উচিত—এরকম সর্ববিষয়ে শিক্ষা দিয়ে পারমার্থিক শিক্ষার প্রথম ধাপে বললেন, ''চাঁদা মামা সকলের মামা। তুমিই তাঁকে বল। যদি

আন্তরিক হয়, কোন ভয় নাই।" শুধু শিক্ষা দিয়েই শেষ নয়, তাঁকে নিজ হাতে গড়ে তোলার উদ্যমও তার সঙ্গে যুক্ত। তাই দেখি অচিরেই এঁদের সম্পর্ক এক অনুপম পরস্পর-নির্ভর সম্পর্ক হয়ে ওঠে, ব্রহ্ম ও শক্তির সম্পর্কের মতন যার একটিকে ছেড়ে অপরটিকে ভাববার অবকাশ নেই। এই অপরূপ যুগলবন্দি ভাবের প্রকাশটির পেছনে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষকসত্তার প্রভাব অপরিসীম।

একটি ধারণা সে-যুগে প্রচলিত ছিল, আজও অল্পবিস্তর লক্ষিত হয় : ধার্মিকতা হল যুক্তিপূর্ণ বাস্তববোধ ও কুশলতার বিপরীতধর্মী। দ্বিতীয়টির অভাব ধার্মিকতার লক্ষণ, এমনকী ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরণও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে দেখালেন যে সঠিক ভক্ত কখনও হাবাগোবা নয়, বরং তার বাস্তববোধ ও কর্মকুশলতা অভক্তের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর নিজের জীবনযাপনের পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা ছিল শিক্ষণীয়। তাঁর কাছে বসবাসকারী বালকভক্তদের শেখাতেন যেখানকার জিনিস ব্যবহারের পরে ঠিক সেই জায়গাতে রেখে দিতে, যাতে এমনকী অন্ধকারেও হাত দিলে সেটি পাওয়া যায়। আর ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরণ বা অন্যমনস্কতা ধর্মজীবনের অন্তরায়, কারণ তা মানসিক সংযমের অভাবসঞ্জাত। ধর্মজীবনে মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, সমনস্কতা একটি অবশ্যসাধন। শ্রীম বারান্দায় ঘটি, পঞ্চবটীতে ছাতা ফেলে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন।

নরেন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টাবক্র সংহিতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়তে বলতেন। নরেন্দ্র হয়তো বললেন—এ তো ঈশ্বরনিন্দা, বলছে ঘটি বাটি মানুষ যা দেখছ সবই ঈশ্বর! ঠাকুর বলতেন, ''তোকে কি পড়তে বলছি, আমাকে পড়ে শোনাতে বলছি।" আসলে ঠাকুর নরেন্দ্রের আঁচলে অদ্বৈতজ্ঞান বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আবার দাস্যভক্তির নিদর্শন বালকভক্ত লাটুকে পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে দেখে বলতেন, ''ওরে লেটো, তুই এখানে বসে আছিস; আর উনি যে নবতে রুটিবেলার লোক পাচ্ছেন না।" লাটু সেই থেকে শ্রীমায়ের সহকারী সেবক। শ্রীশ্রীমা-র নানা ফাইফরমাস খাটা লাটুর মাতৃসাধনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুরের শিক্ষায় একান্ত করে পাওয়া 'দক্ষিণেশ্বরের মা'কে অন্তরের গভীরে নিয়ে চলেছিলেন তিনি সারাজীবন।

আচরণে ভদ্রতা ও সহবতশিক্ষার মূলসূত্রটি হচ্ছে অপরের সুযোগ-সুবিধাকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামজীবনের পটভূমি থেকে এসেছিলেন তাই কথায় গ্রাম্য টান, শব্দব্যবহারে গ্রাম্যতাদোষ ছিল। কিন্তু ওই মূলসূত্রটি তাঁর চরিত্রে জন্মগত স্বাভাবিকতায় ধরা ছিল বলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় তার অভাব কখনও দেখা যায়নি। বরং অপরের ব্যবহারে তার অভাব দেখলে তা শুধরে দিয়েছেন। ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতা যাচ্ছেন যোগীন, কিন্তু ঠাকুরের কাপড়-গামছা সঙ্গে নিতে ভুল হয়েছে। ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—ভুলে গেছি, তবে তারা আপনাকে কাপড়-গামছা দেবে এখন। ঠাকুর তিরস্কার করলেন—সে কী! তারা আতান্তরে পড়বে। ভাববে হাঘরে। যা নিয়ে আয়।

এ-ব্যাপারে এক কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে কথার ফাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজিতে আলোচনা করছেন। এটি যে সহবতবিরোধী তা তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে কিন্তু তুচ্ছ ইংরেজি-না-জানা একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের জন্য এ-সহবত প্রদর্শনযোগ্য বিবেচনা করেননি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কী আলোচনা হচ্ছে জানতে চাইলে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না, দুঃখপ্রকাশ তো নয়ই। ঠাকুর একটি গল্প শুরু করলেন, ''একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুন, একটা গল্প বলি। একজন

নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম (damn) বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর-টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস। নাপিত, সে ছাড়বার নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাবা ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর ড্যামের মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম, আর শুধু ড্যাম নয়। ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।" সকলে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেও শ্লেষটুকু তাঁদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

অদ্বৈতভূমি থেকে দ্বৈতভূমিতে নামলে সংখ্যার মূল্যমানের বোধ বিলুপ্ত থাকে। 'এক, সাত, আট এরকম গোনা হয়'—ঠাকুর বলেছেন। কিন্তু সাধারণ ভূমিতে থাকাকালীন ঠাকুরের তুলনামূলক মূল্যবোধ দৃঢ়ই ছিল। টুলের দাম দু-তিন টাকা শুনে ঠাকুর বলছেন, ''জলপিড়ি যদি বার আনা, ওর দাম অত হবে কেন?" বলতেন, যতক্ষণ দেহবোধ আছে ততক্ষণ জগৎ সত্য, তাই তাঁর বাস্তববোধ যাতে তাঁর ভক্তদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে সঞ্চারিত হয় সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। যোগীনকে একটি কড়াই কিনতে পাঠিয়েছিলেন। যোগীন দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করে বিনা পরীক্ষায় একটি কড়াই কিনে আনলেন। ব্যবহারের সময় দেখা গেল সেটি ফাটা। ঠাকুর তীব্র তিরস্কার করলেন এই বলে, দোকানদার কি ব্যবসার নামে ধর্ম করতে বসেছে যে, ''তুই তার কথায় বিশ্বাস করে কড়াখানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে এলি?" বললেন পাঁচটা দোকান ঘুরে দাম যাচাই করে তারপর জিনিস কিনতে, এমনকী যেসব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় তাও অবশ্য চেয়ে আনতে। স্বামী অখণ্ডানন্দ এ-হুকুম মেনে কাশ্মীরে গিয়ে শাল কিনে কম্ফর্টার ফাউ নিয়ে এলেন। এ-জগতে ঠকে যাওয়া অভ্যাস হয়ে গেলে সে-জগতেও তাই হবে। আসলে ঠকে যাওয়ার মধ্যে যে একটা ন্যূনতা, একটা মনোযোগের ফাঁকি আছে তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাই সেই মন দিয়ে পারমার্থিক জগতেও পাছে আমরা ফাঁকে পড়ি, ঠকে যাই, তাই ঠাকুরের এ-বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও শিক্ষা।

শিক্ষার অন্যতম আর একটি উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে বিচারশক্তির উন্মেষ ঘটানো। ঠাকুর তাঁর কথা, উপদেশ যাচাই করে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বাছাই করে নিতে বলতেন। তিনি বলছেন বলেই নয়, বলতেন—তোমরা 'ল্যাজা মুড়ো' বাদ দিয়ে নিয়ো। অর্থাৎ তোমাদের যুক্তিবুদ্ধি যতটা গ্রহণ করতে পারে ততটাই নাও, নির্বিচারে কিছু নিয়ো না। ঠাকুরের সঙ্গে তর্করত একজনকে দ্বিতীয় জন বললেন—যা বলছেন মেনে নিন না। ঠাকুর তিরস্কার করছেন : ''কথায় বিশ্বাস না করে শুধু মেনে লওয়া! কপটতা! তুমি ঢঙ কাচ দেখছি!" নিজের যুক্তিতে অনড় থেকে অপরকে তুষ্ট করতে মেনে নেওয়ার মধ্যে যে-ভণ্ডামি থাকে তা একজন যথার্থ শিক্ষকের পক্ষে প্রবল বিরক্তির কারণ। তাই ঠাকুরের ভর্ৎসনা।

লাটু নিরক্ষর, তাকে বর্ণপরিচয় করাতে বসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন বল 'ক', সে তার দেহাতি উচ্চারণে বলে 'কা'। ঠাকুর বললেন, ''আরে এখানেই যদি 'কা' বলবি, তবে 'ক'-এ আকারকে কি বলবি?" সে-শিক্ষা বন্ধ হল। শুরু হল অন্য শিক্ষা। সারাদিন ফাইফরমাস খাটা, শেষরাতে ওঠা, সন্ধেবেলা লাটু পড়েছেন ঘুমিয়ে। ঠাকুর তা দেখে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন—যেটি ঈশ্বরচিন্তার শুভক্ষণ

সে-সময়ে ঘুম? লাটু নিদ্রাজয়ের অভ্যাস শুরু করলেন।

সুরেন্দ্র, রাম দত্তের সঙ্গে প্রথম ঠাকুরের কাছে আসবার সময় বললেন—সাধু অনেক দেখেছি, যদি ভণ্ড মনে হয় তাহলে তোমার সামনেই তার কান মুলে দিয়ে আসব। তারপর ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর নিজের অহংকারের কানদুটো এমনই শাসিত হল যে আজীবন নাকে-কানে খত দিয়ে পড়ে রইলেন ঠাকুরের শ্রীচরণে। তাঁর সেই নিঃশর্ত সমর্পণই আজকের রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের গোড়াপত্তনের ভিত্তি।

শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে বেত্রাঘাত ও শাস্তির সম্পর্ক বহুকালের। ঠাকুর শিক্ষকরূপে বেত্রাঘাত করেননি তবে চপেটাঘাতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রানি রাসমণি অতি মাননীয়া, ইংরেজদের পক্ষেও ভীতিপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। মন্দিরে ভবতারিণীর সামনে ঠাকুরের গান শুনতে শুনতে বিষয়ের কথা ভাবছেন। তাঁরই অধীনস্থ সামান্য পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের শিক্ষকসত্তার প্রেরণায় রানির অঙ্গে চপেটাঘাত করে বললেন—এখানেও ওই চিন্তা! বরানগরে গঙ্গার ঘাটে জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় জপ করছেন কিন্তু মনে অন্য চিন্তা, তাঁকেও ঠাকুরের দুই চড়। শিক্ষকের চড়ে ছাত্রের সুবুদ্ধির উদয় হওয়ারই সম্ভাবনা, আর সে-শিক্ষকের মধ্যে যদি ঈশ্বরসত্তার পূর্ণপ্রকাশ থাকে তবে তাঁর চপেটাঘাতে শাসিত ভাগ্যবানের অধ্যাত্মপথে সৌভাগ্য উদিত হবেই।

যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা বেশিরভাগই জ্ঞানের মহিমায় আচ্ছন্ন ও সে-আনন্দের উপভোক্তা। এর মধ্যে বিরল কিছু মানুষ সেই আনন্দের ভাগ দেওয়ার জন্যে সমুৎসুক থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এই সমুৎসুকতা নজিরবিহীন। তিনি তাঁরই বর্ণিত গল্পের সেই তিন বন্ধুর তৃতীয় বন্ধুর মতন, যিনি আনন্দনগরীর প্রাচীরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আনন্দের খোঁজ দিচ্ছেন। যে-ব্যাকুলতায় গঙ্গার ধারে মায়ের অদর্শনে মাটিতে মুখ ঘসে কাঁদতেন, প্রায় সেই ব্যাকুলতায় সন্ধ্যা হলে কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে চিৎকার করে কেঁদেছেন—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। শিক্ষার্থীর জন্যে শিক্ষকের এ-ব্যাকুলতা অভূতপূর্ব।

শিক্ষক পরিপূর্ণতা লাভ করেন একজন সমতুল উত্তরসূরি শিক্ষক তৈরি করে। এ-বিষয়েও ঠাকুর অনন্য। তাঁর পার্ষদেরা সবাই বিশিষ্ট শিক্ষক, তার মধ্যে অতিবিশিষ্ট দুজনকে ঠাকুর জগতকে উপহার দিয়ে গেছেন যাঁদের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী আজও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে চলেছে। প্রিয় নরেন্দ্রনাথকে তিনি শুধু নিজের মনের মতন করে তৈরিই করলেন না, নিজের হাতে লিখে শংসাপত্র দিয়ে গেলেন—নরেন শিক্ষে দিবে। অপরজন শিক্ষয়িত্রী, যিনি সমগ্র জগতকে তাঁর জননীসুলভ স্নেহাঞ্চলে ঢেকে শিক্ষা দিলেন। মানবকুলের শিক্ষার হাতেখড়ি তো জননীর হাত ধরে তাঁর স্নেহের ছায়াতলেই। তাই এঁকে লিখিত শংসাপত্র না দিয়ে ঠাকুর বহু পূর্বেই শিষ্যদের সামনে ঘোষণা করেছিলেন—ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। তাঁর ভবিতব্য তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে—এ আর এমন কী করেছে, তোমাকে এর চেয়ে ঢের বেশি করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ দান এই দুজন, যাঁদের জন্য সমগ্র জগৎ তৃষিত হৃদয়ে অপেক্ষা করছিল। যতিরাজ বিবেকানন্দ বেদান্তশিক্ষার সঙ্গে নিজের জীবনকে বেদান্তের জ্বলন্ত ভাষ্যস্বরূপ রেখে গেছেন, অপরদিকে গার্হস্থ্যজীবনের খুঁটিনাটি কর্মের মধ্য দিয়ে জগজ্জননী সারদা এক নীরব অথচ জীবন্ত বেদান্তভাষ্য রচনা করে গেলেন। আর এই দুই ভাষ্যের সমন্বয়মূর্তি, ধর্মীয় ভাবসমুদ্রের অধীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যশ্রেষ্ঠ, শিক্ষকের শিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন চিরকালের জন্য।